শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ



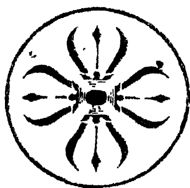
শ্রীইন্দ্রদয়াল ভট্টাচার্য্য প্রণীত।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

বৈশাখ, সন ১৩২৭ সাল।

মূল্য ।০ চারি আনা মাত্র।

১নং মুখার্জ্জি লেন, বাগবাজার,
কলিকাতা,
উদ্বোধন-কার্য্যালয় হইতে
ব্রহ্মচারী গণেন্দ্রনাথ কর্ত্তৃক প্রকাশিত



এই পুস্তকের সমগ্র আয় সিষ্টার নিবেদিতার
বিদ্যালয়ে অর্পিত হয়।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মির্জ্জাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।



ভূমিকা

স্বল্পকায় হইলেও বর্ত্তমান গ্রন্থ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেবের অলৌকিক জীবনের একখানি ভাবশুদ্ধ বিশদ ছবি পাঠকের সম্মুখে ধারণ করিবে। তাঁহার অদৃষ্টপূর্ব্ব ঈশ্বরানুরাগ, সাধনা, দর্শন এবং ধর্ম্মমতের মূল কথাগুলি গ্রন্থকার প্রাঞ্জল ভাষায় এমন সুসন্নিবেশিত করিয়াছেন যে, তরলমতি বালকেরাও উহা অনায়াসে বুঝিতে পারিবে। বালকদিগের জন্য এইরূপ পুস্তক লিখিতে বসিয়া অনেকে ফেনিল ভাষায় কতকগুলি অনাবশ্যকীয় কথা, ও সত্য হউক মিথ্যা হউক গল্পের অবতারণা করিয়াই নিজ কর্ত্তব্য শেষ হইল বিবেচনা করেন। বর্ত্তমান গ্রন্থকার কিন্তু তাহা করেন নাই; বালকদিগের জন্য লিখিতে বসিলেও, তিনি যে ঐ অলোকসামান্য মহাপুরুষের জীবনচরিত লিখিতে বসিয়াছেন, একথা বিস্মৃত হন নাই। গ্রন্থখানির বর্ত্তমান সংস্করণে অনেক বিষয় পরিবর্ত্তিত ও সংযোজিত হইয়াছে। আশা করি, সাধারণ পাঠকের নিকট ইহার অধিকতর সমাদর হইবে।

শ্রীসারদানন্দ।

নিবেদন

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের নাম বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী জানিবার সুযোগ সকলে পান নাই। কেহ কেহ বা যাহা জানেন, তাহা ভ্রমপূর্ণ অথবা অসম্পূর্ণ।

স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত 'লীলাপ্রসঙ্গ' ও শ্রীম-লিখিত 'কথামৃত' পাঠ করিলে ঐ বিষয়ক কথা সকল জানিতে পারা যায়। কিন্তু যাঁহাদের সে সব বই পড়িবার আপাততঃ সুযোগ নাই, তাঁহারা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা পাঠ করিলে পরমহংসদেবের জীবনের প্রধান প্রধান ঘটনা-গুলি জানিয়া রাখিতে পারিবেন।

এই কয়েক পৃষ্ঠা পড়িয়া কাহারো মনে উক্ত মহা-পুরুষ সম্বন্ধে আরো বেশী জানিবার ইচ্ছা হইলে আমাদের পরিশ্রম ও অর্থব্যয় সফল মনে করিব।

এই গ্রন্থের আয় শ্রীমতী ভগিনী নিবেদিতা-প্রতিষ্ঠিত বালিকাবিদ্যালয়ের জন্য উৎসর্গীকৃত হইল।

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ

প্রথম অধ্যায়

কামারপুকুর ও বাল্যজীবন

হুগলী জেলায় কামারপুকুর নামে একখানি গ্রাম আছে। হাবড়া হইতে 'বেঙ্গল-নাগপুর' রেল লাইনের বিষ্ণুপুর বা গড়বেতা ষ্টেশনে নামিয়া গরুর গাড়ীতে কিম্বা পদব্রজে ঐ গ্রামে যাইতে হয়। গ্রামখানি অতি সুন্দর—চারিদিকে মাঠ, পশ্চিম প্রান্তে একটী তালপুকুর, উহার পশ্চিমে স্বল্প দূরে 'ভূতির খাল' নামে একটি সংকীর্ণ খাল ও তাহার তীরে শবদাহের স্থান এবং ঐ খালের পশ্চিমে কিছু দূরে মাঠের মধ্যে সুন্দর আম বাগান। এই আম বাগানে শ্রীরামকৃষ্ণ ছেলাবেলা খেলা করিতেন। গ্রামে বহু জাতীয় লোকের বাস। পূর্ব্বে এই গ্রামে অনেক ধনী লোক ছিলেন, কিন্তু এখন গ্রামের অবস্থা তত ভাল নহে। তদঞ্চলের লোকের দেবদ্বিজে বড়ই ভক্তি ছিল।

এই গ্রামে ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় নামে একজন

দরিদ্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। তিনি সর্ব্বদা ঈশ্বর-চিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। কিন্তু দরিদ্র হইলেও তিনি কখন কাহারও নিকট কিছু চাহিতেন না, ভগবানের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া থাকিতেন, আর তাঁহার ক্ষুদ্র সংসার কোনও রূপে চলিয়া যাইত। সামান্য কিছু জমি ছিল এবং একজন ভাগিনেয় কিছু কিছু সাহায্য করিতেন—উহাতেই ক্রিয়াকর্ম্ম, পূজা দান অতিথি-সেবা সকলই চলিত।

অতিথি-সেবায় ক্ষুদিরামের অত্যন্ত অনুরাগ ছিল। তাঁহার কুটীরের কিছু দূরে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পুরী যাইবার পথ। এই পথে সাধু-সজ্জন সর্ব্বদা যাতায়াত করিতেন এবং কখন কখন গ্রামে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতেন অথবা লোকের দ্বারে অতিথিরূপে উপস্থিত হইতেন। ক্ষুদিরামের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করিয়া তাঁহারা তাঁহার আন্তরিক যত্নে পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। তাঁহাদিগের কাহারও কোন অভাব দেখিলে ক্ষুদিরাম তাহা সাধ্যমত পূরণ করিয়া দিতেন। কেহ কোনও অসুবিধার কথা জানাইলে বহু ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাহা দূর করিয়া দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।

ক্ষুদিরাম উজ্জ্বল গৌরবর্ণ দীর্ঘকায় ছিলেন। তাঁহাকে খুব তেজস্বী ও গম্ভীর দেখাইত। সত্যবাদী,

তপস্বী ও বাক্‌সিদ্ধ বলিয়া গ্রামের লোকে তাঁহাকে দেবতার মত ভক্তি করিত। তিনি গ্রামের হালদার পুকুরে স্নান করিবার কালে তাঁহার সহিত কেহ জলে নামিত না। তাঁহাকে প্রণাম করিয়া পায়ে হাত দিতে লোকে ভয় পাইত, তাঁহাকে রাস্তা দিয়া যাইতে দেখিলে সম্ভ্রমে সকলে দাঁড়াইয়া উঠিত।

এক দিন ক্ষুদিরাম কোন কার্য্যে গ্রামান্তরে যাইতে-ছিলেন, পথে এক গাছ-তলায় বিশ্রাম করিতে গিয়া ঘুমাইয়া পড়িলে শ্রীরামচন্দ্র স্বপ্নে দেখা দিয়া তাঁহাকে বলিলেন, তিনি নিকটবর্ত্তী ভূমিতে বহু দিন যাবৎ পড়িয়া আছেন—অযত্নে অনাহারে তাঁহার বড়ই কষ্ট হইতেছে! ক্ষুদিরাম জাগিয়া চারিদিকে অনুসন্ধান করিয়া একটী শালগ্রাম পাইলেন এবং অত্যন্ত আনন্দের সহিত তাঁহাকে মাথায় তুলিয়া নিজ গৃহে লইয়া গেলেন। তদবধি এই পরিবারে উক্ত শালগ্রাম 'রঘুবীর' নামে অভিহিত ও গৃহদেবতারূপে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

ক্ষুদিরামের পত্নী চন্দ্রমণি দেবী অত্যন্ত সরল-প্রকৃতি ছিলেন। তাঁহার অত্যধিক সরলতা সময় সময় বোকামীর মতন দেখাইত। তাঁহার আপন-পর জ্ঞান ছিল না। অপরের সেবা করিতে তিনি এত ভাল-বাসিতেন যে কখন কখন নিজের অন্ন অতিথি বা ক্ষুধার্ত্ত

প্রতিবাসীকে দিয়া প্রসন্নমনে উপবাসী থাকিতেন। তাঁহার অন্তরে রাগ দ্বেষ বা লোভের গন্ধমাত্র ছিল না। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, কেহ যে মিথ্যা বলিতে পারে, ইহা তিনি কিছুতেই বুঝিতে বা বিশ্বাস করিতে পারিতেন না।

ক্ষুদিরামের রামকুমার ও রামেশ্বর নামে দুই পুত্র ও কাত্যায়নী নামে এক কন্যা জন্মিবার পরে রামকৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। সেদিন সন ১২৪২ সালের ৬ই ফাল্গুন অথবা ইংরাজী ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারী, শুক্লপক্ষ, বুধবার, দ্বিতীয়া তিথি। তাঁহার জন্ম রাত্রি-শেষে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে হইয়াছিল। পিতা মাতা তাঁহার নাম রাখিয়াছিলেন 'গদাধর'। পরে তোতাপুরী গোস্বামী সন্ন্যাস-প্রদান কালে 'রামকৃষ্ণ' নামে তাঁহাকে অভিহিত করেন। এই নামেই তিনি লোকের নিকট পরিচিত। যিনি বেদান্তমতে ঈশ্বর-সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন তিনি সংসারের অসার বস্তু সকল ত্যাগ করিয়া সার ও সত্য বস্তু সর্ব্বদা দেখিতে পান ও গ্রহণ করেন, ঐজন্য শাস্ত্রে তাঁহাকে পরমহংস বলে। রামকৃষ্ণ ঐরূপ অবস্থা লাভ করিলে, তোতাপুরী গোস্বামী তাঁহাকে পরমহংস বলিয়া সম্বোধন করিতে থাকেন। এইরূপে তাঁহার নাম রামকৃষ্ণ পরমহংস হইয়াছিল।

বাল্যকালে তিনি অত্যন্ত সুশ্রী ছিলেন; তাঁহার সরল ব্যবহারে ও বুদ্ধিমত্তায় মুগ্ধ হইয়া গ্রামের সকলে তাঁহাকে বড় ভালবাসিত।

তাঁহার কণ্ঠস্বর অতি মিষ্ট ও স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। যে গানটী একবার শুনিতেন তাহা রাগিণীশুদ্ধ মনে রাখিতে পারিতেন। কথকের মুখে পুরাণের গল্প শুনিয়া তাহা অবিকল ভাবভঙ্গী সহকারে পুনরায় অভিনয় করিতে পারিতেন। গ্রামে লাহাদের বাড়ীতে পূজা-পার্ব্বণে যাত্রাগান কথকতা হইত—রামকৃষ্ণ বহুদিন ব্যাপিয়া তাহার পুনরভিনয় করিয়া গ্রামের বালক বৃদ্ধ স্ত্রী পুরুষ সকলকে আমোদিত করিতেন। তাঁহার সরল ব্যবহার, প্রফুল্লভাব ও আমোদপ্রিয়তায় গ্রামের বালকগণ তাঁহাকে অত্যন্ত ভালবাসিত ও সর্ব্বদা তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। এইরূপে, ক্রমে ক্রমে তিনি গ্রামের বালকদলের নেতা হইয়া উঠিলেন। গ্রামের পশ্চিম প্রান্তে যে একটী আম বাগানের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, তথায় তাঁহার প্রধান আড্ডা ছিল। সেখানে নানা প্রকার নূতন নূতন খেলার উদ্ভাবন করিয়া সঙ্গী-দিগকে লইয়া তিনি আনন্দ করিতেন। যাত্রা গানের পালা সকল তাঁহার কণ্ঠস্থ ছিল। তিনি বালকদল লইয়া সময় সময় সেইগুলি অভিনয় করিতেন; কৃষ্ণলীলায়

তিনি নিজে কৃষ্ণ অথবা রাধা ও রামলীলায় রাম সাজিতেন। তাঁহার অভিনয় এত ঠিক ঠিক হইত যে, যে দেখিত সে-ই মুগ্ধ হইত। অভিনয় করিতে করিতে কখন কখন তিনি এত বিভোর হইয়া যাইতেন যে, তাঁহার বাহ্যজ্ঞান থাকিত না। ইহাতে তাঁহার সঙ্গী বালকগণ অত্যন্ত ভয় পাইত ও নিকটবর্ত্তী 'ভূতির খাল' হইতে জল আনিয়া তাঁহার চোকে মুখে দিত এবং গাছের কচি কচি ডাল ভাঙ্গিয়া বাতাস করিত।

লাহাদের বাটীর আটচালায় একটী গ্রাম্য পাঠশালা বসিত। রামকৃষ্ণ তথায় পড়িতে যাইতেন। সেখানেও ছাত্রবন্ধুদিগকে লইয়া তাঁহার গান অভিনয় চলিত। গুরু মহাশয় সর্ব্বদা শুনিতেন, গদাধর খুব গান গাহিতে ও অভিনয় করিতে পারে—তাই, তিনি একদিন একটু অভিনয় করিয়া দেখাইবার জন্য তাহাকে অনুরোধ করেন। রামকৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ তাঁহার বন্ধুগণকে একটী ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত করিয়া গান জুড়িয়া দিলেন। গুরু মহাশয় বালকের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিয়া ভাবিলেন, এ বালক সামান্য নহে!

গদাধরের মুখে পুরাণের গল্প ও ধর্ম্মবিষয়ক গান শুনিতে গ্রামের স্ত্রী পুরুষ সকলে বড় ভালবাসিত। তিনিও ঐ সকল আবৃত্তি করিয়া সকলকে আনন্দিত

করিতে ত্রুটি করিতেন না। গ্রামে এমন অনেক লোক ছিলেন যাঁহারা গদাধরকে না দেখিয়া অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিতেন না—একবেলা না দেখিলে খুঁজিতে বাহির হইতেন। গদাধরের উচ্চ-নীচ জ্ঞান ছিল না। নীচ জাতীয়দের বাটীতে যাইয়াও তিনি প্রহ্লাদ-চরিত্র, ধ্রুব-চরিত্র বা রামায়ণ পাঠ করিয়া তাহাদিগকে শুনাইতেন। ঐরূপে গদাধর কামারপুকুর গ্রামকে চির-উৎসবময় করিয়া তুলিয়াছিলেন। তিনি মূর্ত্তিমান উৎসবস্বরূপ ছিলেন—কেহ কোনও কারণে বিমর্ষ হইয়া তাঁহার নিকট আসিলে অচিরে তাহার বিষণ্ণভাব দূর হইয়া যাইত।

রামকৃষ্ণের সাত বৎসর বয়স কালে ক্ষুদিরাম দেহ-ত্যাগ করিলেন। রামকুমার ও রামেশ্বরের উপর এখন সংসারনির্ব্বাহের ভার পড়িল। ক্ষুদিরামের সংসার ছিল যেন মহাদেবের সংসার—না ছিল সঞ্চয়, না ছিল কোন নির্দ্দিষ্ট আয়। আবার, দানধর্ম্মের ত্রুটি ছিল না। পুত্র-গণের প্রকৃতিও পিতার ন্যায় ছিল—সৎকার্য্য, দেবপূজা, অতিথিসেবা হওয়া চাই, কিন্তু কিরূপে অর্থোপার্জ্জন করিতে হয় সে বিষয়ে আদতে জ্ঞান নাই! ক্ষুদিরামের স্বর্গারোহণের পর নানা কারণে ইঁহাদের আয় কমিয়া গেল, কিন্তু ব্যয় বাড়িয়া উঠিল। অভাবে পড়িয়া

রামকুমার কিছু ঋণ করিয়া ফেলিলেন। ঋণ পরিশোধের কোন উপায় নাই দেখিয়া আত্মীয়গণ অর্থোপার্জ্জনের জন্য তাঁহাকে কলিকাতায় যাইতে পরামর্শ দিলেন। তদনুসারে তিনি কলিকাতায় গিয়া ঝামাপুকুর নামক স্থানে একটী টোল স্থাপন করিলেন। রামকৃষ্ণের বয়স তখন চৌদ্দ বৎসর। ইতিপূর্ব্বে নয় বৎসর বয়সে তাহার উপনয়ন হইয়া গিয়াছিল এবং তিনি বাড়ীতে ৺রঘুবীরের সেবা-পূজা করিতেছিলেন।

বাড়ীতে থাকিয়া রামকৃষ্ণের পড়াশুনা হইতেছে না দেখিয়া রামকুমার সতর বৎসর বয়স কালে তাঁহাকে কলিকাতায় লইয়া আসিলেন। তিনি ভাবিলেন এখানে তাহার পড়াশুনাও চলিবে, পূজা পাকশাক প্রভৃতিতেও কতক সাহায্য হইবে। বস্তুতঃ রামকৃষ্ণের দ্বারা তাঁহার বেশ সাহায্য হইতে লাগিল। কিন্তু পড়াশুনায় তাঁহার তেমন উৎসাহ দেখা গেল না। শিশুকাল হইতেই ধর্ম্ম-বিষয় ব্যতীত অন্য কিছুতে তাঁহার মন বসিত না। গান, খেলা, আমোদ, সকল বিষয়েই তাঁহার ঐ ভাব প্রকাশ পাইত। তাঁহার দেহমন যেন ভক্তিতে গঠিত ছিল। এই জন্যই তিনি ভালরূপে লেখাপড়া শিখিতে পারিলেন না।



রাণী রাসমণির কালীবাড়ী

কলিকাতার জানবাজারে রায় রাজচন্দ্র দাস নামে একজন জমিদার ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পত্নী শ্রীমতী রাসমণি এমন দক্ষতার সহিত বিশাল জমিদারীটী পরিচালন করেন যে, লোকে তাঁহার তেজস্বিতা ও দয়া প্রভৃতি গুণে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে 'রাণী' নামে অভিহিত করিত। বস্তুতঃ তাঁহার প্রকৃতি ও চালচলন ঠিক রাণীর মতই ছিল। তাঁহার শৌর্য্যবীর্য্য পরোপকার দান ও অন্যান্য কীর্ত্তির কাহিনী বঙ্গের সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে।

রাসমণি কলিকাতায় তিন মাইল উত্তরে, গঙ্গাতীরে দক্ষিণেশ্বর নামক গ্রামে একখণ্ড ভূমি ক্রয় করিয়া বহু অর্থব্যয়ে একটী প্রকাণ্ড ঠাকুরবাড়ী নির্ম্মাণ করেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ ও শ্রীশ্রীকালিকামাতার বিগ্রহ স্থাপন করিয়া তথায় শাস্ত্রবিহিত পূজার বন্দোবস্ত করিবেন এবং দেবতার প্রসাদের দ্বারা সাধু ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগের সেবা করা চলিবে। এ বিষয়ের

যথাশাস্ত্র ব্যবস্থা করিবার জন্য রাণী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে আহ্বান করিলেন। পণ্ডিতগণ সমবেত হইয়া রাণীর উদ্দেশ্য শ্রবণ মাত্র একবাক্যে বলিলেন, রাণী কৈবর্ত্ত বংশীয়া সুতরাং কোনও সদ্ব্রাহ্মণই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কালীর পূজা করিতে পারেন না এবং শূদ্রজাতি প্রতিষ্ঠিত দেবতাকে অন্নভোগ কখনই দেওয়া যাইতে পারে না।

ব্যবস্থা শুনিয়া রাণী বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন, তাঁহার বড় আদরের শ্যামা ও শ্যামের সেবায় বড়ই বিঘ্ন উপস্থিত! রাণীর মন পণ্ডিতগণের এ ব্যবস্থায় প্রবোধ মানিল না। শাস্ত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধির কোনও উপায় অবশ্য মিলিবে, এই বিশ্বাসে তিনি নানা স্থানে পণ্ডিতদিগের নিকট ব্যবস্থা চাহিয়া পাঠাইলেন, কিন্তু কেহই রাসমণির ইচ্ছামত দেবসেবার সমর্থন করিলেন না।

ঘটনাক্রমে রামকুমারের কর্ণে এই সংবাদ পৌঁছিল। রামকুমার অত্যন্ত সরলবিশ্বাসী ছিলেন। তিনি ভাবিলেন, পণ্ডিতগণ নিশ্চয়ই ভ্রমে পতিত হইয়াছেন—শাস্ত্র কি এমন ভাবে কাহাকেও দেবসেবায় বঞ্চিত করিতে পারে? অবশ্যই ইহার কোনও উপায় আছে। অনেক চিন্তার পর তিনি ব্যবস্থা লিখিয়া

পাঠাইলেন,—রাণী তাঁহার গুরুকে কালীবাড়ী দান করিয়া ফেলিলে, গুরুর নামে প্রতিষ্ঠিত ঠাকুর-বাটিতে দেবতার পূজা ও অন্নভোগ দেওয়া যাইতে পারে। এই ব্যবস্থা পাইয়া রাণী যার পর নাই সুখী হইলেন এবং রামকুমারকে আশাতিরিক্ত পুরস্কার দিলেন।

রামকুমারের ব্যবস্থা অনুসারে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ও শ্রীশ্রীকালীমাতার প্রতিষ্ঠার জন্য একটী দিন নির্দ্ধারিত হইল। কিন্তু প্রতিষ্ঠা কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযুক্ত লোক পাওয়া গেল না। কাজেই রামকুমারকে তাহা করিতে হইল। সেদিন স্নানযাত্রা—সন ১২৬২ সালের ১৮ই জ্যৈষ্ঠ, ইংরাজী ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে। রামকৃষ্ণ সেই দিন কালীবাড়ীর মহোৎসব দর্শন করিতে গেলেন। কিন্তু সেখানে অন্নগ্রহণ করিলেন না—বাজার হইতে মুড়িমুড়কি কিনিয়া খাইলেন।

উপযুক্ত পূজকের অভাবে রামকুমারকেই মা কালীর পূজক হইতে হইল। মন্দির-সংক্রান্ত সকল বিষয় তত্ত্বাবধানের ভার লইলেন রাণীর জামাতা শ্রীমান মথুরামোহন বিশ্বাস। রামকৃষ্ণ কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিয়া কি করিবেন ভাবিতে লাগিলেন। কারণ কৈবর্ত্তের কালীপূজা, কৈবর্ত্তের অন্নগ্রহণ তিনি ধর্ম্মসঙ্গত মনে করিলেন না। রামকুমার অবশেষে তাঁহাকে নিকটে

ডাকাইয়া শাস্ত্রের বিধান ও অন্য নানা উপায়ে বুঝাইয়া দিলেন যে, মা কালীর পূজকের পদ ও প্রসাদ গ্রহণ করিয়া তিনি কোনও অন্যায় কাজ করেন নাই। তখন হইতে রামকৃষ্ণ ভ্রাতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে বাস করিতে লাগিলেন। ১৮

রামকৃষ্ণের আকৃতি প্রকৃতি দর্শনে মথুরবাবু তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তাঁহার অপূর্ব্ব সরলতা-ব্যঞ্জক মুখখানি যে দেখিত সে-ই মুগ্ধ হইত। শেষ বয়সে ডাক্তার মহেন্দ্রলাল প্রভৃতি তাঁহার এই অদ্ভুত সরলতা দেখিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে 'প্রকৃতির শিশু' নামে অভিহিত করিতেন। একদিন মথুরবাবু দেখিলেন রামকৃষ্ণ নিজের পূজার জন্য একটী শিবমূর্ত্তি গড়িয়াছেন। মূর্ত্তিটী এত সুন্দর হইয়াছে যে, সচরাচর এমন সুন্দর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় না। মথুরবাবু এই মূর্ত্তিগঠনে বালকের অসাধারণ প্রতিভার পরিচয় পাইয়া অত্যন্ত মুগ্ধ হইলেন এবং রাণীকে মূর্ত্তিটী দেখাইয়া বালকের প্রতিভা, তেজোময় কান্তি, ধর্ম্মভাব, সরলতা প্রভৃতির বিষয় বলিলেন। তদবধি মথুরবাবু রামকৃষ্ণকে ঠাকুর-সেবার কোনও কাজে নিযুক্ত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; কিন্তু রামকৃষ্ণ কিছুতেই সম্মত হইলেন না। তিনি মথুরবাবুর সম্মুখে যাইতেন না,

পলাইয়া পলাইয়া থাকিতেন। অবশেষে পরিবারবর্গের অর্থাভাব, ভ্রাতার অনুরোধ ও মথুরবাবুর আগ্রহ প্রভৃতি ভাবিয়া মা কালীর বেশ-কারীর কার্য্য গ্রহণ করেন। তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় এই সময় কার্য্যের অনুসন্ধানে আসিয়াছিলেন, তিনি রামকৃষ্ণের সহকারী নিযুক্ত হন।

রাধাগোবিন্দের পূজক একদিন শয়ন করাইবার কালে অসাবধানতা বশতঃ ঠাকুরকে হাত হইতে ফেলিয়া দিয়া তাঁহার একখানি পা ভাঙ্গিয়া ফেলেন। এই বিষয় লইয়া কালী বাড়ীতে মহা গোলমাল আরম্ভ হয়। কেহ বলিতে লাগিল 'ভগ্নদেবতার পূজা নিষেধ, ইহাকে ফেলিয়া দিয়া অন্য মূর্ত্তি স্থাপন করিতে হইবে।' কেহ বা বলিল 'দেবতা কি ফেলিয়া দেওয়া যায়?' শাস্ত্র-বিধান জানিয়া ঐ বিষয়ে নিজ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের জন্য রাণী কয়েক জন পণ্ডিত ডাকাইলেন। পণ্ডিতগণ ভগ্ন-দেবতা ফেলিয়া দেওয়ার ব্যবস্থাই করিলেন। সর্ব্বশেষে রামকৃষ্ণের মত জানিতে চাহিলে তিনি ভাবতন্ময় হইয়া বলিলেন যে, "আমাদের কোন আত্মীয়ের পা ভাঙ্গিলে কি আমরা তাহাকে পরিত্যাগ করি অথবা তাহার পা যাহাতে সারিয়া যায়, এইরূপ চিকিৎসা করি। এই বিষয়েও সেইরূপ করা হউক। ঠাকুরের পা ভাঙ্গি-য়াছে বলিয়া ফেলিয়া দিব কেন?" রাণী ও মথুরবাবু এই

ব্যবস্থা শুনিয়া খুব আনন্দিত হইলেন। আর, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের পা এমন নিপুণভাবে জুড়িয়া দিলেন যে তাহা কখন ভাঙ্গিয়াছিল বলিয়া টের পাওয়া গেল না।

অসাবধানতা অপরাধে রাধাগোবিন্দের পূজক পদচ্যুত হইলেন এবং তাহার স্থলে রামকৃষ্ণ নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে, রামকুমার দেহত্যাগ করিলে, রামকৃষ্ণ মা কালীর পূজা করিতে লাগিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়

অপূর্ব্ব পূজা ও অদ্ভুত দর্শন

প্রতিষ্ঠা করিবার সময়ে প্রত্যেক দেব-দেবীর একটি নাম দেওয়া হয়। রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত মা কালীর নাম শ্রীশ্রীভবতারিণী। রামকৃষ্ণ মা ভবতারিণীর সেবায় ক্রমেই অত্যন্ত তন্ময় হইয়া যাইতে লাগিলেন। সকালে ফুল তুলিয়া নিজ হাতে মালা গাঁথিতেন, স্নান করিয়া পূজায় মনোনিবেশ করিতেন এবং পূজা শেষ হইলে মাকে গান শুনাইতেন। রামপ্রসাদ, রাজা রামকৃষ্ণ প্রভৃতি সাধকগণের মাতৃভাবপূর্ণ গান গাহিতে গাহিতে তিনি ভাবোন্মত্ত হইয়া যাইতেন, তাঁহার গণ্ড বাহিয়া অনবরত অশ্রু ঝরিত। অপরাহ্ণে মাকে বাতাস করিতেন অথবা মার প্রীতির জন্য কোন না কোন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। রাত্রে 'শীতল' দেওয়া হইলে প্রসাদ পাইয়া শয়ন করিতেন, কিন্তু কাল কিরূপ সেবা করিয়া মাকে সুখী করিবেন এই চিন্তায় তাঁহার ঘুম আসিত না। এইরূপে দিন রাত্রি মার চিন্তায় কাটিয়া যাইতে লাগিল।

দিনে দিনে তাঁহার তন্ময়তা ক্রমে এত বাড়িয়া গেল

যে, গান করিতে বসিলে আর গান শেষ হয় না, মার চিন্তা করিতে বসিলেই গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়া যান, আরাত্রিক করিতে গিয়া যন্ত্রের মত বহুক্ষণ ধরিয়া আরতি-প্রদীপ চালনা করিতে থাকেন—প্রদীপ নিভিয়া যাইত, বাদকেরা ক্লান্ত হইয়া কাঁসার ঘড়ি রাখিয়া দিত, কিন্তু আরতি ফুরাইত না।

পাষাণময়ী মূর্ত্তির সেবা এবং কল্পিত রূপের ধ্যান করিতে রামকৃষ্ণের এখন আর ভাল লাগিল না। মাকে সাক্ষাৎ—জীবন্তরূপে—পাইবার জন্য তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পূর্ব্বে তিনি লীলাচঞ্চল সদানন্দ ছিলেন, এখন কেমন বিমনা গাম্ভীর্য্যময় হইয়া গেলেন। সকলে ভাবিল বয়সের সঙ্গে এমন পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে।

এখন যে স্থানে পঞ্চবটী আছে সেই স্থানটীর পার্শ্ব-দেশ তখন নীচু ও জঙ্গলপূর্ণ ছিল এবং তাহার ভিতরে একটী আমলকী বৃক্ষ ছিল। রামকৃষ্ণ এই সময় রাত্রে ঐ গাছের তলায় বসিয়া ধ্যান করিতেন। পূজা, ধ্যান ও সেবা করিতে করিতে তাঁহার ব্যাকুলতা ক্রমে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিল। মনের ভাব আর চাপিয়া রাখিতে পারিলেন না! আহার নিদ্রা ভুলিয়া দিন রাত মা মা বলিয়া ধূলায় লুটাইয়া কাঁদিতে লাগিলেন। পুত্রশোকে মাতা যেমন অধীর হন অথবা, মাতৃহীন শিশু

যেমন চারিদিক অন্ধকার দেখে, তিনি তাহা হইতেও অধিকতর অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহার আর্ত্তনাদ শুনিয়া কেহ অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিত না, বোধ হইত যেন সত্যই তাঁহার বুক পুড়িয়া যাইতেছে। ক্রমে যখন তাঁহার এমন অবস্থা হইল যে, মাকে না দেখিলে আর এক দণ্ডও বাঁচিয়া থাকিতে পারেন না, তখন ত্রিভুবন আলো করিয়া মা দেখা দিলেন। রামকৃষ্ণ দেখিলেন,—জগতের সমুদয় রূপ যেন একত্রিত ও ঘনীভূত হইয়া শ্যামারূপ ধরিয়া আসিয়াছে, তাঁহার চাহনিতে যেন জগৎটা নড়িতেছে—সেই দৃষ্টি যেন সকল লোকের হৃদয়ের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতেছে। রামকৃষ্ণ মায়ের এই রূপ দেখিতে দেখিতে আত্মহারা হইয়া গেলেন, দুই তিন দিন আর বাহ্যজ্ঞান রহিল না।

আমরা সামান্য রূপবান্ বা গুণবান্ লোককে ভালবাসিয়া তাঁহার বিরহে কত কষ্ট পাই, আর যিনি সকল রূপের ও সকল গুণের আধার তাঁহার বিরহ না জানি কতই কষ্টকর। মা'কে একবার মাত্র দেখিতে পাইয়া রামকৃষ্ণের প্রাণ তাঁহাতেই মগ্ন হইয়া যাইল, এবং কিছুক্ষণ মা'কে না দেখিলে তিনি যেন আর জীবন ধারণ করিতে পারেন না—এইরূপ হইতে লাগিল। তাঁহার সে অধীরতা এক আশ্চর্য্য ব্যাপার।—তিনি গঙ্গাতীরে

যেখানে সেখানে ধূলায় পড়িয়া 'মা মা' করিয়া গভীর আর্ত্তনাদ করিতেন। লোকে তাঁহার এই কষ্টের কথা কিছুই বুঝিতে পারিত না; কেহ ভাবিত তাঁহার শূল-ব্যথা আছে, কেহ ভাবিত এ পাগল। বিরহ-ব্যথায় কখন কখন তিনি আছড়াইয়া পড়িতেন, কখন বা গঙ্গার তীরে কাদায় পড়িয়া ছট্‌ফট্‌ করিতেন। মাকে না দেখিতে পাইলেই তাঁহার ঐরূপ যন্ত্রণা হইত। কিন্তু ঐ যন্ত্রণা যখন অসহ্য হইত তখনই মা দেখা দিয়া তাঁহাকে নানাপ্রকারে সান্ত্বনা দিতেন। ক্রমে মা ঘন ঘন দেখা দিতে লাগিলেন এবং বুঝাইয়া দিলেন যে, তিনি দূরে চলিয়া যান না, তাঁহার হৃদয়মধ্যে ও ঠাকুরঘরের মূর্ত্তিতে তিনি জীবন্তরূপে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। মা যেমন ছেলেকে লইয়া আনন্দ করেন, মা ভবতারিণী তেমনই রামকৃষ্ণকে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন।

এক্ষণে তাঁহার অধীরতা-ব্যাকুলতা দূর হইল বটে কিন্তু তাঁহার মা ভবতারিণীর প্রতি ভালবাসা আর এক নূতন আকারে প্রকাশ পাইল। তিনি পাষাণময়ী কালীর সঙ্গে কথা বলেন, হাস্য করেন, তাঁহাকে নৈবেদ্য খাওয়াইতে যান, মার বিছানায় শুইয়া থাকেন। কখন মার নৈবেদ্য কাক বিড়ালকে খাওয়ান, কখন বা নিজেই খাইতে থাকেন; মার পায়ে ফুল না দিয়া নিজের মাথায়

দেন, আবার কখন বা চারিদিকে ছড়াইয়া ফেলেন। মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ এই সকল অত্যন্ত অনাচার মনে করিলেন। কিন্তু রামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্ত তেজোময় চেহারা দেখিয়া তাঁহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিতে, এমন কি, তাঁহার নিকটে যাইতেও সাহস করিলেন না। তাহারা মথুরবাবুকে জানাইলেন যে, রামকৃষ্ণ বদ্ধ পাগল হইয়া কালীমন্দিরে 'যা ইচ্ছে তাই' করিতেছেন ; সত্বর তাঁহাকে মন্দির হইতে দূর না করিলে দেবতা তাঁহার অনাচারে রুষ্ট হইবেন।

হৃদয়, মাতুলের অসুখ হইয়াছে মনে করিয়া, প্রথমে তাঁহার চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিলেন। কিছুতেই কিছু হইল না। তিনি কোনরূপে মার পূজা চালাইয়া মাতুলের কাজটী বহাল রাখিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু, অবশেষে মাতুলের পাগলামি চাপা দিয়া রাখা অসম্ভব হইয়া উঠিল। মথুর বাবু রামকৃষ্ণের অসুখের বিষয় জানিতেন, তিনি মনে করিয়াছিলেন উহা সারিয়া যাইবে। কিন্তু, যখন শুনিলেন রামকৃষ্ণ একেবারে বদ্ধ পাগল হইয়া গিয়াছেন, তখন তিনি চিন্তিত হইলেন এবং কালী বাড়ীতে আসিয়া রামকৃষ্ণের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন। মথুরের বুঝিতে বিলম্ব হইল না যে, মা কালী কৃপা করিয়া রামকৃষ্ণের সঙ্গে

সত্য সত্যই মায়ের মত ব্যবহার করেন! মথুরের হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি রামকৃষ্ণকে আপন ইষ্টদেবতার ন্যায় জ্ঞান করিয়া তদনুরূপ ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ এই উল্টা উৎপত্তি দেখিয়া অবাক্ হইয়া রহিল।

মথুর বাবু অতি আনন্দের সহিত রাণীকে এই সংবাদ দিলে, রাণী রামকৃষ্ণের এই অপূর্ব্ব ব্যবহার দেখিতে আসিলেন। মন্দিরের কর্ম্মচারিগণ ভাবিলেন রামকৃষ্ণ কোন 'গুণ' করিয়া মথুরকে ভুলাইয়াছেন, কিন্তু রাণী আসিয়া তাঁহাকে নিশ্চয়ই মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিবেন। শুনিয়াছি—যে দিন রাণী আসিবেন শুনা গেল সেই দিন মন্দিরের কোন কর্ম্মচারী রামকৃষ্ণকে ভয় দেখাইয়া বলিয়াছিল যে, রাণী আসিয়া তাঁহাকে মন্দির হইতে বাহির করিয়া দিবেন। তিনি ইহা শুনিয়া বড়ই ভীত হইলেন এবং পাঁচ বৎসরের বালকের ন্যায় পরণের কাপড় বগলে করিয়া মা কালীর আঁচল ধরিয়া প্রতিমার পেছনে লুকাইয়া রহিলেন। রাণী আসিলে আরও জড়সড় হইয়া আঁচল প্রাণপণে আঁটিয়া ধরিলেন এবং ভীত চকিত নয়নে মার আড়াল হইতে মাঝে মাঝে রাণীর গতিবিধি দেখিতে লাগিলেন। ভক্তিমতী রাণী এ দৃশ্য দেখিয়া কাঁদিতে লাগিলেন।

তিনি বুঝিতে পারিলেন, মা ভবতারিণীকে সত্য সত্য মা বলিয়া না দেখিলে রামকৃষ্ণ কখন ঐরূপ শিশুর মত আচরণ করিতে পারিতেন না। তাঁহার এত অর্থব্যয় করিয়া মাকে প্রতিষ্ঠা করা আজ সার্থক হইল ভাবিয়া তিনি নিজকে কৃতার্থ মনে করিলেন। মন্দিরের মূর্খ কর্ম্মচারিগণ মথুর অপেক্ষা রাণীকে অধিকতর মুগ্ধ হইতে দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হইয়া রহিল।

এখন হইতে মা ভবতারিণী আর পাষাণের প্রতিমা রহিলেন না, তিনি চিন্ময়ীরূপে রামকৃষ্ণকে ধরা দিয়া আপনার লীলারসে তাঁহাকে ডুবাইয়া রাখিলেন। মন্দিরে প্রচলিত নিয়ম সকল মানিয়া প্রতিদিন নিয়মিত সময়ে ৺ভবতারিণী দেবীর পূজা ভোগ আরতি ও অন্য সকল সেবার কার্য্য করা তাঁহার পক্ষে সম্ভবপর নয় দেখিয়া রাণী হৃদয়কে এখন হইতে মা কালীর নিত্য-পূজায় নিযুক্ত করিলেন। ইহার পরে রাণী রাসমণি ও মথুরবাবু যতদিন জীবিত ছিলেন প্রাণপণে রামকৃষ্ণের সেবা করিয়াছিলেন। মথুর বাবুর দেহত্যাগের পর তাঁহার পুত্রগণও রামকৃষ্ণের সেবায় ত্রুটি করেন নাই।

চতুর্থ অধ্যায়

সকল প্রকার ধর্ম্মসাধন

মাকে বারম্বার দেখিতে পাওয়ায় রামকৃষ্ণের অধীরতা অনেকটা দূর হইল। তিনি এখন বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার লোভ ও অভিমান সমূলে বিনষ্ট হয় নাই, সেই জন্যই মাকে ইচ্ছামাত্র সর্ব্বদা দেখিতে পান না। তাই লোভ দূর করিবার জন্য এক হাতে একটী টাকা ও অপর হাতে একটী মাটীর ঢেলা লইয়া গঙ্গাতীরে বসিয়া এইরূপ বিচার করিতে লাগিলেন—টাকার দ্বারা অনেক সৎকার্য্য হইতে পারে বটে কিন্তু উহা দ্বারা অনেক দুষ্কার্য্যও হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, টাকা হাতে থাকিলে বড়ই অভিমান হয় এবং টাকার লোভ বিন্দুমাত্র থাকিলে ভগবান লাভ হয় না। অতএব যে ভগবান লাভের চেষ্টা করে তাহাকে মাটির ঢেলাটি যেমন কোন সাহায্য করিতে পারে না, এই টাকাও তেমনি কোন সাহায্য করিতে পারে না। অতএব এই টাকাতে আর মাটীর ঢেলাতে কোনও তফাৎ নাই। এই ভাবিয়া 'টাকা-মাটী—মাটী-টাকা' বলিতে বলিতে যখন ভগবান-লাভের পথে টাকা ও মাটীর মূল্য

সমান বোধ হইল তখন মাটীর ঢেলা এবং টাকা গঙ্গার জলে ফেলিয়া দিলেন। অভিমান-ত্যাগের জন্য কাঙ্গালী-দের এঁটো পাত মাথায় করিয়া ফেলিলেন এবং তিনি মেথরের চাইতেও বড় নহেন, এই কথা ভাবিয়া স্বহস্তে ঝাঁটা লইয়া পাইখানা পরিষ্কার করিলেন।

ঐরূপ নানা সাধনা দ্বারা তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ নির্ম্মল হইয়া গেল, লোভের বা অভিমানের আভাস মাত্রও রহিল না। এখন হইতে তাঁহার আশ্চর্য্য বিনয় দেখিয়া অতি বড় দাম্ভিকেরও দম্ভ চূর্ণ হইত, তাঁহার লোভহীন চরিত্র দেখিয়া অর্থলোভীর মোহ দূর হইত। তিনি দীন কাঙ্গালের মত দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে পড়িয়া থাকিতেন, তাঁহাকে সামান্য লোক ভাবিয়া যে সে তাঁহার কাছে গিয়া সরলভাবে ধর্ম্মালাপ করিত এবং তাঁহার জ্ঞানসিন্ধুর বিন্দুমাত্র পান করিয়া লোকের জীবন পরি-বর্ত্তিত হইয়া যাইত।

একদিন রামকৃষ্ণ মা কালীকে বলিলেন, "মা আমি মূর্খ, লেখা পড়া জানি না, শাস্ত্র জানি না। তুই দয়া করিয়া আমায় সকল ধর্ম্মের, সকল শাস্ত্রের সার জানাইয়া দে।" জগজ্জননী প্রিয় পুত্রের অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য তাঁহাকে একে একে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মমতে সাধনা করাইয়া সকল ধর্ম্ম এক ভগবানের কথা নানারূপে

বলিতেছে, এই মহাসত্য শিক্ষা দিলেন। মা কালীর কৃপায় রামকৃষ্ণ বুঝিতে পারিলেন, সকল ধর্ম্মের দ্বারাই ঈশ্বর লাভ করা যায়,—'যত মত তত পথ'।

ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রথমে তিনি তাঁহার কুলদেবতা রঘুবীরের আরাধনায় নিযুক্ত হন। শ্রীরামচন্দ্রের প্রধান ভক্ত হনুমান যে ভাবে রামকে চিন্তা করিতেন তিনি সেই ভাবে রঘুবীরের উপাসনা আরম্ভ করেন। আত্মবিস্মৃত হইয়া তিনি এখন আপনাকে রামচন্দ্রের দাস হনুমান বলিয়া মনে করিতে থাকেন। তাঁহার আকৃতিপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া যায়, তিনি বৃক্ষে আরোহণ করিয়া বসিয়া থাকিতেন, বানরের মতন চঞ্চল হইয়া গাছের ডালে লাফালাফি করিতেন, খোসা-শুদ্ধ ফল ভিন্ন অন্য কিছু খাইতেন না। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া হৃদয় প্রভৃতি অত্যন্ত ভীত হইয়াছিল। তিনি ভূতগ্রস্থ হইয়াছেন, এমত আশঙ্কাও কাহারো কাহারো মনে উঠিয়াছিল।

রামকৃষ্ণের ভাবোন্মত্ততার কথা তাঁহার মাতা প্রভৃতি আত্মীয়গণ শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রথম বার, তিনি যখন একটু শান্ত হইলেন, তখন তাঁহারা মনে করেন, রোগ সারিয়া যাইতেছে। কিন্তু উহার কিছু দিন পরে তিনি হনুমানের ভাবে ঐরূপ বিকট

কাণ্ড করিতে আরম্ভ করিয়াছেন—সংবাদ পাইয়া চন্দ্রাদেবী ও রামেশ্বর অত্যন্ত ভয় পাইলেন। কনিষ্ঠ সন্তানের উপর পিতা-মাতার একটু বেশী স্নেহ থাকে—বিশেষতঃ, গদাধরের অতি সরল প্রকৃতি মনকে সহজেই আকর্ষণ করিত। একে ত বিদেশে বাস করায় চন্দ্রাদেবী সর্ব্বদাই রামকৃষ্ণের জন্য চিন্তিত থাকিতেন, তাহাতে আবার তাঁহার ঐরূপ আচরণের কথা শুনিয়া তিনি অধীর হইয়া উঠিলেন। তাঁহাকে কামারপুকুরের বাড়িতে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। রামকৃষ্ণও ইতিমধ্যে হনুমান-ভাবে সিদ্ধিলাভ করিলেন এবং পূর্ব্বের ন্যায় শান্ত হইয়া বাড়িতে আসিলেন।

রামকৃষ্ণের আগমন-সংবাদ শুনিয়া প্রতিবাসিগণ তাঁহাকে দেখিতে আসিলেন। কেন না তাঁহারা ইঁহার সম্বন্ধে ইতিপূর্ব্বে কত কথাই শুনিতেছিলেন। তাঁহারা দেখিলেন পূর্ব্ববৎ সরল ও প্রফুল্ল থাকিলেও তাঁহাদের গদাই যেন এখন ভগবানের ভাবে ডুবিয়া গিয়াছে, ভগবানের কথা বই অন্য কথা বলে না, কখন কখন ভাবে বিভোর হইয়া অচেতন হইয়া যায়। তাঁহার আত্মীয়গণ ভাবিলেন এত ভাবভক্তি ভাল নহে, ইঁহার শীঘ্র শীঘ্র বিবাহ দেওয়া উচিত। তাহা হইলে সংসারে মন আসিবে, এসব পাগলামীও দূর হইয়া যাইবে। ঐ

পরামর্শ স্থির করিয়া তাঁহারা কামারপুকুরের চারি মাইল পশ্চিমে জয়রামবাটী গ্রামের শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের পঞ্চম বর্ষীয়া কন্যার সঙ্গে তাঁহার শুভ বিবাহ সম্পন্ন করিলেন।

বাড়ীতে আসিয়াও রামকৃষ্ণ সর্ব্বদা ধ্যানচিন্তায় মগ্ন থাকিতেন। রাত্রি হইলে গ্রামের বাহিরে "ভূতীর খালের" অথবা 'বুধুই মোড়লের' শ্মশানে গিয়া ধ্যান করিতেন। সেখানে নাকি তাঁহার অতি অদ্ভুত ভৌতিক ব্যাপার সকল দর্শন হইত। কেহ সেই স্থানের নিকট-বর্ত্তী হইলে পাছে সে ভূত দেখিয়া ভয় পায়, এই জন্য তিনি তাহাকে সত্বর দূরে চলিয়া যাইতে বলিতেন।

কিছুদিন পরে রামকৃষ্ণ কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। এই সময় একজন সন্ন্যাসিনী দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি রামকৃষ্ণকে দেখিবামাত্র মহাপুরুষ বলিয়া চিনিতে পারেন এবং তাঁহাকে তান্ত্রিক প্রণালী অনুসারে সাধনা শিক্ষা দেন। তান্ত্রিক সাধনা বড়ই কঠিন, অত্যন্ত জটিল ও গোপনীয় বলিয়া জগতে ইহার প্রচার খুব অল্পই হইয়াছে। অতি উচ্চ প্রকৃতির সাধক না হইলে ইহাতে সহজেই বিপথগামী হইবার আশঙ্কা। ইহা দ্বারা অতি সহজে ঈশ্বর লাভ হয়, শুনা যায় কিন্তু সেই সব সাধনপ্রণালীর নাম শুনিলেও ভয় হয়।

এই সন্ন্যাসিনী তন্ত্রশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন এবং সাধনরহস্যও জানিতেন। তাঁহার উপদেশ মত রামকৃষ্ণ প্রধান প্রধান চৌষট্টি খানা তন্ত্রের সমুদয় সাধন-প্রণালী একে একে অবলম্বন করিয়া প্রত্যেকটীতে সিদ্ধিলাভ করেন। এই সময়ে কত অদ্ভুত কাণ্ড হইত তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। সমস্ত দিন রামকৃষ্ণ নানা ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন, আর সন্ন্যাসিনী সাধনার প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করিতেন। সন্ধ্যা হইতে ক্রিয়া-কলাপ আরব্ধ হইত এবং প্রভাতে শেষ হইত। কালী বাড়ীর ঈশান কোণে বিল্ববৃক্ষ-মূলে পাঁচটী মড়ার মাথা পুতিয়া 'পঞ্চমুণ্ডী' আসন করা হয় এবং সেই স্থানেই শ্মশান-সাধনা নামক জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্য সাধনা অনুষ্ঠিত হয়। গঙ্গাতীরে পঞ্চবটী ও তুলসী কানন করিয়া রামকৃষ্ণ নানা ভাবে সাধনা করেন। তান্ত্রিক সাধনার পর তিনি বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুসারে সাধনা করিয়া ভগবান লাভ করেন। শান্ত, দাস্য প্রভৃতি পাঁচ-ভাবের প্রত্যেক ভাবেই সাধনা করিয়াছিলেন; আবার পাঞ্চরাত্র গৌড়ীয় প্রভৃতি বিভিন্ন পন্থারও অনুসরণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বোক্ত সন্ন্যাসিনী বৃন্দাবন-লীলার গান গাহিতেন আর শুনিতে শুনিতে রামকৃষ্ণ সমাধিমগ্ন হইয়া যাইতেন। যখন যে ভাবের সাধনা করিতেন

তাহার সর্ব্বপ্রকার নিয়ম-প্রণালী তিনি মানিয়া চলিতেন। মধুরভাবে সাধনাকালে শ্রীরাধার সখি ভাবিয়া স্ত্রীলোকের পোষাক পরিয়া থাকিতেন এবং কৃষ্ণপ্রেমের জন্য দিবারাত্রি শ্রীরাধার নিকট ব্যাকুল ভাবে প্রার্থনা করিতেন। শ্রীগৌরাঙ্গের ধ্যান-চিন্তা করিয়া তাঁহার দর্শন পাইয়াছিলেন, ভাবের চক্ষে শ্রীগৌরাঙ্গের মহা-সঙ্কীর্ত্তন দেখিয়াছিলেন। হনুমানের ভাবে শ্রীরামের উপাসনার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা হইয়াছে। এখন আবার বাৎসল্যভাবে শ্রীরামের উপাসনা করিয়া তাঁহাকে লাভ করেন। ইহার পর শৈব সাধনা করিয়াছিলেন।

সর্ব্বশেষে নাগা সম্প্রদায়ের উলঙ্গ সন্ন্যাসী যতিরাজ শ্রীশ্রীমৎ তোতাপুরী স্বামী পরমহংস পরিব্রাজক মহা-রাজ স্বেচ্ছাক্রমে ভ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। রামকৃষ্ণকে দেখিয়া তিনি তাঁহাকে বেদান্ত-সাধনার উচ্চ অধিকারী বলিয়া চিনিতে পারেন এবং জ্ঞানযোগ সাধন করিবেন কি না তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন। রামকৃষ্ণ স্বীকৃত হইলে, তাঁহাকে যথাবিধি সন্ন্যাস ও সন্ন্যাসাশ্রমের নাম (রামকৃষ্ণ) প্রদান করিয়া বেদান্ত শাস্ত্রের উপদেশ দিতে লাগিলেন। একটু আধটু উপদেশ দিতে না দিতেই তোতা দেখিলেন রামকৃষ্ণ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে মগ্ন হইয়া গিয়াছেন। যে

সমাধি লাভ করিতে তাঁহার চল্লিশ বৎসরের প্রাণপণ চেষ্টার প্রয়োজন হইয়াছিল, রামকৃষ্ণ তাহা অনায়াসে দুই তিন দিনেই লাভ করিলেন দেখিয়া মহাজ্ঞানী তোতা চমৎকৃত হইলেন। তাঁহার ইচ্ছা ছিল দুই তিন দিন এখানে থাকিয়া চলিয়া যাইবেন কিন্তু এই আশ্চর্য্য শিষ্যটীকে পাইয়া এগার মাস রহিয়া গেলেন।

এইরূপে মাত্র দ্বাদশ বৎসরে রামকৃষ্ণ ভারতবর্ষে প্রচলিত সর্ব্ব-প্রকার ধর্ম্মমতের সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। ঐ সকল মতের এক একটীতে সিদ্ধিলাভ করিতে তাঁহার তিন দিনের অধিক সময় লাগে নাই। যখন যে ভাবে সাধনা করিতে তাঁহার ইচ্ছা হইত ভগবানের কৃপায় তাহার অনুকূল বিষয়সমূহ তখনি আসিয়া উপস্থিত হইত এবং উপযুক্ত উপদেষ্টাও আসিয়া জুটিতেন। এক একটী মতে সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি কিছু দিন ঐ ভাবে বিভোর হইয়া থাকিতেন। তখন সেই মতের সিদ্ধ ও সাধক পুরুষগণ আসিয়া সেই বিষয়ের আলোচনায় তাঁহার সহিত আনন্দ করিতেন ও তাঁহার নিকটে উপদেশ গ্রহণ করিতেন। এই দ্বাদশ বৎসর তিনি এক নিমেষের জন্যও নিদ্রা যান নাই। ঐকালে তাঁহার আহারাদির কোনও নিয়ম ছিল না, কোথা দিয়া দিন রাত্রি চলিয়া যাইত অনেক সময় তাঁহার জ্ঞান

থাকিত না এবং মাথার চুলে জটা বাঁধিয়াছিল। পঞ্চবটী তলায় ধ্যানস্থ রামকৃষ্ণকে জড়বস্তু মনে করিয়া পক্ষিগণ তাঁহার মাথায় বসিয়া খেলা করিত। এক সময়ে এমন গভীর ধ্যানে মগ্ন হইয়াছিলেন যে, তাঁহাকে দেখিয়া সকলে মৃত মনে করে। ভাগ্যে একজন সাধু তখন কালী বাড়ীতে আসিয়াছিলেন, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, এই মহাপুরুষ সমাধিস্থ। অনেক দিন এইরূপ থাকিলে দেহত্যাগ হইবে, তাই তিনি ছয় মাস তাঁহার নিকটে থাকিয়া অতি কষ্টে তাঁহার সমাধি ভঙ্গ করিয়া সময় সময় কিছু কিছু খাওয়াইতেন। সাধনাকালে তাঁহার ঐরূপ কত প্রকারের অলৌকিক 'অবস্থা' হইয়াছিল তাহা এই ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বর্ণনা করা অসম্ভব। যাঁহারা বিশেষ জানিতে চাহেন তাঁহারা শ্রীমৎ স্বামী সারদানন্দ বিবৃত "লীলাপ্রসঙ্গ" নামক পুস্তকগুলি পাঠ করিবেন।

এই সকল কঠোর সাধনায় তাঁহার দেহ এবং মনের এক আশ্চর্য্য অবস্থা হইয়াছিল। শরীরটী শিশুর মত কোমল হইয়া গিয়াছিল। আমরা যেমন শৈত্য ও উষ্ণতা অনুভব করিয়া থাকি, নিকটে আসিবা মাত্র তিনি তেমনই অপরের শরীর-মনের পবিত্রতা-অপবিত্রতা অনুভব করিতেন। কোন খারাপ লোক তাঁহার দেহ

স্পর্শ করিলে তিনি যেন জ্বলন্ত অঙ্গারের স্পর্শ অনুভব করিতেন। ধাতুনির্ম্মিত কোন বস্তু স্পর্শ করিতে পারিতেন না—নিদ্রিত অবস্থায়ও তাঁহার হস্তে টাকা-মোহর ছোঁয়াইলে শিঙ্গিমাছের কাঁটা ফোটার ন্যায় কষ্ট পাইতেন। তাঁহার মনটী সমুদয় জগতের দর্পণস্বরূপ হইয়া গিয়াছিল। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান তিনি সম্মুখস্থ পদার্থের ন্যায় স্পষ্ট দেখিতে পাইতেন। মনের এমন শক্তি হইয়াছিল যে ইচ্ছামাত্র যে কোনও লোকের মনে ধর্ম্মভাবের সঞ্চার করিয়া দিতেন।

এইবার, মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীরা কি ভাবে ভগবান লাভ করেন, দেখিতে তাঁহার সাধ হইল। তাই তিন দিন ঐ ভাবে থাকিয়া দেখিলেন, মুসলমানের খোদাতে আর হিন্দুর ঈশ্বরেতে কেবল ভাষারই ভেদ, মূলবস্তু এক-ই। এইরূপে খ্রীষ্টানদের ভাবেও তিন দিন ছিলেন এবং দেখিলেন ঐ ধর্ম্মপথেও ভগবানকে পাওয়া যায়।

সর্ব্ববিধ সাধনায় সিদ্ধি লাভের পর তাঁহার ভয়ানক উদরাময় পীড়া হইল। বহু চিকিৎসাতে অসুখ না সারায় সকলে পরামর্শ দিল, দেশে গিয়া দিন কতক থাকিলে জল হাওয়া পরিবর্ত্তনে রোগ সারিতে পারে। তদনুসারে মথুর বাবু ঠাকুরের সর্ব্বপ্রকার ব্যয়ের বন্দোবস্ত

করিয়া হৃদয়কে সঙ্গে দিয়া তাঁহাকে স্বদেশে পাঠাইলেন। দিন কতক সেখানে থাকায় তাঁহার পেটের অসুখ সারিয়া গেলে তিনি আবার কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন।

ইহার পর মথুর বাবুর সঙ্গে তিনি কাশী প্রভৃতি তীর্থস্থান দর্শন করিতে যান। কাশীতে বিশ্বনাথ দর্শন করিতে যাইবার সময় পথে শিবের চিন্তা করিতে করিতে সমাধিস্থ হইয়া গেলেন। আর, বাহ্যচক্ষুতে বিশ্বনাথ দর্শন হইল না, জ্ঞানচক্ষুতে তাঁহার চিন্ময় মূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। কোন দেবতা-দর্শনে যাইলে তিনি প্রায় এইরূপে সমাধিস্থ হইতেন, আর বাহ্যচক্ষে দেবদর্শন হইত না। কিন্তু যিনি হৃদয়মধ্যে জীবন্ত ভগবানকে দেখিতে পান তাঁহার শিলাপ্রস্তরের মূর্ত্তি দেখিবার কি প্রয়োজন! বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল দেখিয়া 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া কাঁদিয়া আকুল হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণের পরমভক্ত গঙ্গামাতা নাম্নী সন্ন্যাসিনীঃ তাঁহাকে বৃন্দাবনে রাখিয়া দিবার জন্য বড়ই জেদ করিয়াছিলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

ধর্ম্মপ্রচার দেহরক্ষা ও শেষ কথা

ফুল ফুটিলে যেমন আর ভ্রমরকে ডাকিয়া আনিতে হয় না তেমনি মানবহৃদয়ে ভগবানের যথার্থ প্রকাশ উপস্থিত হইলে সাধুভক্তগণ আপনা হইতেই তাঁহাকে খুঁজিয়া বাহির করেন। রামকৃষ্ণের নিকট ভারতের সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সিদ্ধপুরুষ ও সাধকগণ আসিতেন, একথা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন কলিকাতা ও নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি মাত্রই তাঁহার নিকট আসিতে লাগিলেন। নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতি তাঁহার প্রধান শিষ্য সকলে এই সময়ে আসেন।

ব্রাহ্ম সমাজের কেশবচন্দ্রের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইলে কেশব তাঁহার পাঁচ বছরের বালকের মত সরল ভাবে ভগবান্‌কে 'মা' 'মা' বলিয়া ডাকা ও তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরের ভাব দেখিয়া একান্ত মুগ্ধ হইলেন। তিনি তাঁহার প্রচারিত খবরের কাগজে এই আশ্চর্য্য সাধুর কথা লিখিতে লাগিলেন, আর দলে দলে লোক যাইয়া তাঁহার করুণা-সরলতা মাখা পবিত্র মূর্ত্তি, উদার

মন ও অদ্ভুত ঈশ্বরানুরাগ দেখিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিল।

তখন অনেক শিক্ষিত হিন্দু ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব বুঝিতে না পারিয়া একবারে নাস্তিকের মত হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা রামকৃষ্ণের নিকট গিয়া দেখিতেন তিনি দিবা-রাত্র ভগবানের ভাবে আনন্দে মগ্ন! তাঁহার ভগবৎপ্রেম দেখিয়া তাঁহাদের সন্দেহ দূর হইয়া যাইত। গিরিশ ঘোষ, ডাক্তার রামচন্দ্র, প্রফেসার মহেন্দ্র গুপ্ত প্রভৃতি তাঁহার উদার ধর্ম্মভাবে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এই মহেন্দ্রবাবুই 'কথামৃত' লিখিয়াছেন। তিনি রামকৃষ্ণের মুখে যে সব অপূর্ব্ব উপদেশ শুনিতেন, বাড়ীতে আসিয়া নিজের আনন্দের জন্য, তাহা লিখিয়া রাখিতেন। এখন তাই প্রকাশ করিয়া বাংলাদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছেন। মহাত্মা দুর্গাচরণ নাগ প্রভৃতি মহাপুরুষগণ এই সময়েই ইঁহার ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করেন। মহাত্মা বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামী তাঁহার নিকট গিয়া ধর্ম্মকথা শুনিতেন। বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্র, মধুসূদন দত্ত প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণ এই মূর্খ ব্রাহ্মণের অগাধ জ্ঞান দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন।

স্বামী বিবেকানন্দের পূর্ব্ব নাম ছিল শ্রীনরেন্দ্রনাথ দত্ত। তিনি শিশুকাল হইতে লক্ষ্য করিতেন, সকলেই

ধর্ম্মের কথা বলে, কিন্তু ভগবান্‌কে দেখিয়াছে এমন কথা কেহ বলে না—যেন ধর্ম্ম কেবল কথার কথা, কেবল আলোচনারই বিষয়! আবার কেহ বা একটু আচার-অনুষ্ঠান, ধ্যান-চিন্তা করে বটে কিন্তু ভগবান্‌কে লাভ করিবার জন্য ব্যস্ত নহে! তাঁহার আশৈশব সত্যলাভের, ধর্ম্ম লাভের জন্য একটা ব্যাকুলতা ছিল। কিন্তু এই সব দেখিয়া তিনি হতাশ হইয়া গিয়াছিলেন। ঘটনাচক্রে রামকৃষ্ণের নাম শুনিয়া তিনি তাঁহার নিকট গিয়া দেখিলেন, সেই মহাপুরুষ সর্ব্বস্বত্যাগ করিয়া কেবল ভগবান্‌কে লইয়া আছেন—কথা বলিতে বলিতে হৃদয়মধ্যে ভগবান্‌কে দেখিতেছেন, আর সমাধিস্থ হইতেছেন! দিবারাত্র ভগবানের কথাই বলেন, পাঁচ বছরের বালক যেমন মা বই আর কিছুই জানে না, তেমনি তিনি ভগবান্ বই আর কিছুই জানেন না! আবার সকল ধর্ম্মই তাঁহার নিকট সমান—কৃষ্ণ, খোদা, গড, কালী—তাঁহার নিকট সকলই এক। সকল মানুষের ভিতরই তিনি ভগবান্ দেখেন, এমন কি, ভগবানের মূর্ত্তি জ্ঞানে জগতের সকল বস্তু ও ব্যক্তিকে প্রণাম করেন! নরেন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনের পূর্ণ আদর্শ রামকৃষ্ণের নিকট পাইয়া তাঁহার শ্রীচরণে মনপ্রাণ সঁপিয়া দিলেন। রামকৃষ্ণও উপযুক্ত শিষ্য পাইয়া তাঁহাকে তাঁহার মহাসমন্বয় ধর্ম্মে দীক্ষিত

করিলেন এবং জগতে তাহা প্রচারের জন্য তাঁহাকে প্রস্তুত করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে রাখাল প্রভৃতি সংসারবিরাগী শুদ্ধচিত্ত বালকগণ তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করিলেন।

রামকৃষ্ণের শরীরের ধাতু বালকের ন্যায় ছিল, একটুতেই ঠাণ্ডা লাগিত। একদিন ঠাণ্ডা লাগিয়া তাঁহার গলার বীচি সকল ফুলে, ইহা বাড়িয়া ক্রমে ঘায়ে পরিণত হইল। শিষ্যগণ চিকিৎসার সুবিধার জন্য তাঁহাকে কলিকাতার শ্যামপুকুর নামক পল্লীতে রাখিয়া বড় বড় ডাক্তারকে আনাইয়া চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন, কিন্তু রোগ ক্রমশঃ বাড়িতেই লাগিল। অবশেষে তাঁহারা কলিকাতার উত্তর প্রান্তে কাশীপুরে একটী বাগানবাড়ী ভাড়া করিয়া তাঁহাকে তথায় লইয়া গিয়া প্রাণপণে শুশ্রূষা করিতে লাগিলেন; কিন্তু কোনও ফলই দেখা গেল না।

এই সময়েও তাঁহার নিকট অনেক লোক আসিত। তাঁহার এত অসুখ, তবু লোককে উপদেশ দিতে বিরত হইতেন না। যখন একেবারে কথা বলিতে পারিতেন না, তখনও কাহাকে স্পর্শ করিয়া, কাহারও প্রতি কৃপাদৃষ্টি করিয়া, কাহাকেও বা আশীর্ব্বাদ করিয়া মনে ধর্ম্মভাব সঞ্চার করিয়া দিতে লাগিলেন। বাজারে আসিয়া ফল-

বিক্রেতা যেমন প্রথমে দর কষাকষি, ওজন হিসাব করিয়া ফল বিক্রয় করে, কিন্তু যখন সন্ধ্যা হইয়া আসে তখন বাড়ী ফিরিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া যাহা তাহা লইয়া অবশিষ্ট ফল একরূপ বিলাইয়াই দিয়া যায়, সেইরূপ রামকৃষ্ণ শীঘ্রই দেহত্যাগ হইবে জানিয়া যাহাকে পাইলেন তাহাকেই ধর্ম্মভাব দিতে লাগিলেন।

একদিন রাত্রে তিনি গভীর সমাধিতে মগ্ন হইয়া গেলেন। সকলে ভাবিলেন শীঘ্রই আবার বাহ্যজ্ঞান আসিবে, কিন্তু রাত্রি চলিয়া গেল তাঁহার সমাধিভঙ্গ হইল না, অধিকন্তু দেহে মৃতের লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। (সে দিন সন ১২৯৩ সালের ৩১শে শ্রাবণ, ইংরাজী ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১১ই আগষ্ট। শিষ্যগণ জীবনের কর্ণধার প্রেমময় গুরুদেব মহাসমাধিমগ্ন হইয়াছেন বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইলেন এবং পর দিন সন্ধ্যাকালে গঙ্গাতীরে অপাপবিদ্ধ গুরুদেহের সংকার করিয়া শূন্যমনে গৃহে ফিরিয়া গেলেন।)

বালকভক্তগণ গুরু বই আর কিছুই জানিতেন না। তাঁহারা আর সংসার করিতে পারিলেন না—বাড়ী ঘর ছাড়িয়া সকলে একস্থানে সমবেত হইয়া সন্ন্যাসীর মত জীবন যাপন করিতে লাগিলেন। কয়েক বৎসর কঠোর সাধনা করিয়া তাঁহারা গুরুর উপদেশসমূহ কার্য্যে

পরিণত করিলেন। তখন তাঁহারা এই মহান্ আদর্শ জগতে প্রচার করিবার জন্য নানা উপায় অবলম্বন করিতে লাগিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ (নরেন্দ্রনাথ) পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে ঘুরিয়া হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। একে একে ভারতবর্ষে নানা স্থানে মঠ স্থাপিত হইতে লাগিল। এই সকল মঠে বাস করিয়া রামকৃষ্ণের সন্ন্যাসী শিষ্যগণ ধর্ম্মপ্রচার করিতেছেন এবং বহুলোক তাঁহাদের ত্যাগের আদর্শ গ্রহণ করিয়া ধন্য হইতেছে !

এখন পৃথিবীর অনেক দেশে এবং ভারতের প্রায় সকল প্রসিদ্ধ স্থানে, রামকৃষ্ণের ভক্তগণ সেই মহান্ আদর্শ অনুসারে নিজ নিজ জীবন গঠন করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

সমাপ্ত।

উদ্বোধন

স্বামী বিবেকানন্দ-প্রতিষ্ঠিত 'রামকৃষ্ণ-মঠ' পরিচালিত মাসিক পত্র। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য সডাক ২, টাকা। উদ্বোধন-কার্য্যালয়ে স্বামী বিবেকানন্দের ইংরাজী ও বাঙ্গালা সকল গ্রন্থই পাওয়া যায়। "উদ্বোধন"গ্রাহকের পক্ষে বিশেষ সুবিধা। নিম্নে দ্রষ্টব্য :—

পুস্তক	সাধারণের পক্ষে	গ্রাহকের পক্ষে
বাঙ্গালা রাজযোগ (৪র্থ সংস্করণ)	১,	৸৹
„ জ্ঞানযোগ (৬ষ্ঠ ঐ)	১।৹	১,
„ ভক্তিযোগ (৭ম সংস্করণ)	॥৵৹	॥৹
„ কর্ম্মযোগ (৫ম ঐ)	৸৹	॥৹
„ পত্রাবলী ১ম ভাগ, (৩য় সংস্করণ)	॥৹	।৵
„ ঐ ২য় ভাগ (৩য় সংস্করণ)	॥৵৹	॥৹
„ ঐ ৩য় ভাগ (২য় সংস্করণ)	॥৵৹	॥৹
„ ভক্তি-রহস্য (৩য় সংস্করণ)	৸৹	॥৵৹
„ চিকাগো বক্তৃতা (৪র্থ সংস্করণ)	।৹	।৹
„ ভাব্‌বার কথা (৪র্থ সংস্করণ)	।৵৹	।৹
„ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য (৫ম সংস্করণ)	॥৹	।৵
„ পরিব্রাজক (৩য় সংস্করণ)	৸৹	॥৹
„ ভারতে বিবেকানন্দ (৪র্থ সংস্করণ)	২,	১৸
„ বর্ত্তমান ভারত (৫ম সংস্করণ)	।৹	।৹
„ মদীয় আচার্য্যদেব (২য় সংস্করণ)	।৵৹	।৹
„ বিবেক-বাণী (৪র্থ সংস্করণ)	৵৹	৵৹
„ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথি	২॥৹	২,

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ—(পকেট এডিশন) (৯ম সং) স্বামী ব্রহ্মানন্দ সঙ্কলিত, মূল্য ।৹ আনা। ভারতে শক্তিপূজা—স্বামী সারদানন্দ-প্রণীত মূল্য ।৵৹, উদ্বোধন-গ্রাহক-পক্ষে ।/৹ আনা। মিশনের অন্যান্য গ্রন্থ এবং, শ্রীরামকৃষ্ণদেবের ও স্বামী বিবেকানন্দের নানা রকমের ছবির ক্যাটালগের জন্য পত্র লিখুন।

হিন্দুধর্ম্মের নবজাগরণ—স্বামী বিবেকানন্দ প্রণীত মূল্য ।৵৹ আনা।